তারিখ ... 21 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

শিক্ষা-সমস্যা : গাইড বই, প্রাইভেট ও উচ্চফলন

আলমগীর খান

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় এখন উচ্চফলন চলছে। ক'বছর ধরে ছাত্রছাত্রী যেভাবে উচ্চ নম্বর পেয়ে উচ্চ হারে পরীক্ষায় পাস করছে তা অভূতপূর্ব। অথচ দেশের মানুষ যে এ নিয়ে খুব খুশি তা বলা যাচ্ছে না। বরং অনেকেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং শিক্ষায় এ আকস্মিক উন্নতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন। কেন?

উচ্চফলন আজকাল সব কিছুতেই। আম, লিচু, আনারস, টমেটো, কিসে নয়– আর সেই সাথে বিস্তর আলোচনা চলছে কী উপায়ে এসব উচ্চফলন ঘটানো হচ্ছে। এখন বাজারে ফল দেখলে অনেকেরই জিভে জল আসে না, বরং হৃদপিণ্ডে কাঁপুনি হয় যে কবে নষ্ট কিডনি নিয়ে হাসপতালে ভর্তি হতে হবে আর কিভাবে চিকিৎসার টাকা জোগাড় হবে। সত্যমিথ্যা জানি না, তবে মানুষের এমন দুশ্চিন্তা আজকাল হচ্ছে। একবার চুন খেয়ে যার জিভ পুড়েছে, সে মেঘ দেখেও ভয় পেতে পারে। আম, লিচু, আনারস, আপেল, আঙুর ফল নিয়ে ভয় পেতে পেতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফল দেখেও এখন লোকজন ভয় পেতে শুরু করেছে। তবে এমন ভিন্ন দুরকম ফলের ফলন যেভাবে বাড়ানো হচ্ছে, তাতে কোন মিল আছে কি?

সম্প্রতি একটি টেলিভিশনের প্রতিবেদনে দেখা গেল, ভালো ফল করা ও জিপিএ-৫ পাওয়া এসএসসি পাস ছেলেমেয়েরা খুব সাদামাটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না। অর্থাৎ তারা সনদপত্র পেলেও তেমন কোনো শিক্ষা পায়নি। সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবেদনটি ব্যাপকভবে ছড়িয়ে পড়ে ও আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। এটির এত দ্রুত জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে, এতে যে সত্যকে নগ্ন করে তুলে ধরা হয়েছে, অর্থাৎ পাশের হার যে হারে বাড়ছে শিক্ষার মান সেই হারে নামছে, তা মানুষের মনের কথার সঙ্গে একসুরে বেজে উঠেছে। এজন্য আবার এটি অনেকের গা-জ্বলার কারণ হয়েছে। প্রতিবেদনটি সমালোচনার উর্ধ্বে নয় মেনে নিয়েও বলতে হবে, এর উপস্থাপিত সত্যটি ফেলনা নয়।

পাসের হার শতভাগ হোক ও সবাই ভালো ফল করুক, এটি সবারই আশা। ভবিষ্যতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি উন্নত হলে, সেটাই হওয়ার কথা। কিন্তু শতভাগ উন্নত ফলের সম্পর্ক শতভাগ শিক্ষা অর্জনের সঙ্গে। যদি দেখা যায়, শিক্ষার অর্জন কমছে আর উন্নত ফল বাড়ছে, তা খুবই আশঙ্কাজনক। ঘটনা যে এখন অনেকটা তেমনই, তা মানুষ এ প্রতিবেদনের অনেক আগে থেকেই আঁচ করেছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও খুব জোর দিয়ে বলতে পারি, উক্ত টেলিভিশন প্রতিবেদনটিতে যে প্রশ্ন এসএসসি পাস ছাত্রছাত্রীরা পারেনি, এখনকার অনেক মাস্টার্স পাসওয়ালাদের বেলায়ও ওরকমই হবে।

তাই বলে সব ছাত্রছাত্রীই এরকম তা নয়। দেশে ভালো পড়ালেখাও হয়। সেটি টাকা দিয়ে কিনতে হয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে বাণিজ্যিক করে ফেলা হয়েছে যে, যে যত পয়সা খরচ করতে পারবে, সে তত উন্নত শিক্ষা কিনে নিতে পারবে। অর্থাৎ মানসম্মত শিক্ষা শুধু ধনিক শ্রেণীর সন্তানদের জন্য। গরিব ছেলেমেয়েদের জন্য সান্ত্বনারূপ সনদ থাকবে, মানসম্মত শিক্ষা ধরাছোঁয়ার বাইরে। বাস্তব জীবনে চাকরিতে ও কর্মক্ষেত্রে তাদের সবসময় হারতে হবে। এরকম পরিস্থিতি যেদিকে পরিণতি পেতে পারে তা কারো কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। শেয়ার বাজারের চড়া মৌসুমে অনেক গরিব মানুষও তাদের ঘটিবাটি বিক্রি করে শেয়ার কিনে। ক'দিন পর দেখা যায়, চড়া দামে কেনা শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো নামমাত্র মূল্যের কিছু কাগজমাত্র যা কোথায় বিকোয় না। তখন কাগজ নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে রাস্তায় বসে পড়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। শিক্ষার সনদপত্র হাতে নিয়ে গরিব ছেলেমেয়েদের তেমন দশা কারো কাম্য নয়।

টেলিভিশন প্রতিবেদনটিতে যে ছেলেমেয়েদের দেখানো হয়েছে, তারা নিঃসন্দেহে পরে লজ্জায় পড়েছে। তাদের পরিচিতজনদের কাছে তারা খাটো হয়ে গেছে। তবে এতসব সহজ প্রশ্নের উত্তরও দেশের বহু মানুষ দিতে পারবে না। তাদের ক্ষেত্রে সেটি হাস্যকর হয়েছে এ কারণে যে, তাদের হাতে জিপিএ-৫ মার্কা সনদপত্র আছে। তারা কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি, তাই বলে ঘুষও খায়নি বা দুর্নীতিও করেনি। কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারাটা কোনো অপরাধ নয়। তবু মনে হচ্ছে, তারা যেন কোনো অপরাধ করে ফেলেছে। অথচ এসব সনদপত্রতো তারা কেউ চুরি করে জোগাড় করেনি, শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তারা দিয়েছেন। তাহলে এসব সহজ প্রশ্নের উত্তর যারা দিতে পারেননি তারা আসলে শিক্ষাবিভাগের সেই হর্তাকর্তারা। এসব ছেলেমেয়েকে দেশব্যাপী হাসির পাত্রে পরিণত করেছেন আসলে সেই কর্তাব্যক্তিরাই। করেছেন নিজেদের স্বার্থে। এক, বাহাদুরি নেওয়ার জন্য যে, তাদের হাতে কতকত ছেলেমেয়ে কি আকাশচুম্বী ফল করে স্কুলকলেজ থেকে বের হচ্ছে! দুই, শিক্ষার সনদপত্র ছাপিয়ে ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিয়েই তারা তাদের দায়িত্ব শেষ করেছেন, প্রকৃত শিক্ষা দেয়ার বাড়তি কষ্ট স্বীকার না করেই। আর এ দ্বিতীয়টি নিঃসন্দেহে বড় রকমের অন্যায়।

ওসব প্রশ্নের উত্তর দেশের বহু মানুষ বলতে পারবে না। আবার অনেক ছেলেমেয়ে যারা জিপিএ-৫ পায়নি বা হয়তো পরীক্ষায়ও পাস করেনি, তারাও দিতে পারবে। কিন্তু এ প্রশ্নোত্তরগুলো জেনে তাদের কি লাভ হয়েছে, যদি পরীক্ষা পাসের বা ভালো ফলের সার্টিফিকেটই না থাকে? তেমন ছেলেমেয়েকে কি রাষ্ট্র উচ্চশিক্ষা লাভের বা জীবনে সফল হওয়ার রাস্তা দিবে? সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটাই তৈরি করা হয়েছে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়াকে কেন্দ্র করে। ভালো ফল করে পরীক্ষায় পাস করলে সাফল্যের দুয়ার খুলে যাবে, এমন ভাব। ছেলেমেয়েরা তাই করছে রাষ্ট্র তাদের কাছ থেকে যা চাচ্ছে। যারা রাষ্ট্রের এ আব্দার রাখতে পারছে না, তারা দূরে ছিটকে পড়বে।

ভালোভাবে পড়ালেখা, সঠিক জ্ঞানার্জন ও সর্বোপরি মনুষ্যত্ব অর্জনের সঙ্গে পরীক্ষায় ভালো ফলের সম্পর্ক ওতপ্রোত নয়। অর্থাৎ ভালোভাবে পড়ালেখা ও সঠিক জ্ঞানার্জন করলে পরীক্ষায় ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে, নাও পারে। এটি নির্ভর করছে পরীক্ষার্থী ভালো ফল করার কতক কৌশল রপ্ত করতে পেরেছে কি পারেনি তার ওপর। এসব কৌশলের মধ্যে সাধু, অল্প সাধু ও অসাধু সবই থাকে। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র ফল জেনেই সন্তুষ্ট হয়, কৌশল কী নিয়ে মাথা ঘামায় না। এটুকুই নয়, ভালোভাবে পড়ালেখা, সঠিক জ্ঞানার্জন ও মনুষ্যত্ব অর্জন ছাড়াই শুধু অব্যর্থ কৌশল রপ্ত করেও পরীক্ষায় ভালো ফল করা যায়। তদুপরি যারা সনদপত্র দিবেন, তারা যদি শিক্ষার্থীর উচ্চ ফলের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন, তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কারো পক্ষেই ভালো ফল না করে থাকার উপায় নেই! যাই হোক, পরীক্ষায় উচ্চফলনের সাধু কৌশলসমূহের মধ্যে অগ্রগণ্য গাইডবই, প্রাইভেট পড়া ইত্যাদি।

এখনকার ছাত্রছাত্রী এতোটা গাইডবই নির্ভর যে অনেকে পারতপক্ষে ক্লাসের মূল বই পড়ে না। এসব বই আগেও ছিলো, তবে এগুলোর এমন ভয়াবহ আধিপত্য ছিলো না। এখন এমন হয়েছে যে, কলেজ পর্যায়ে অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা মূল বই চোখেও দেখেনি। এর ফলে কোনো বিষয় আদৌ আত্মস্থ না করেই শুধু প্রশ্নোত্তর উগড়ে দিয়ে ভালো নম্বর পেয়ে সাফল্যের সিঁড়িতে চড়া যায়। এরকম বেশি নম্বর পাওয়া সফল শিক্ষার্থীদের দামী পেশাসমূহে অনুপ্রবেশের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। আর তাই সরকারের মাথাব্যথা যে ছাত্রছাত্রী নোটবই ছেড়ে মূল বই পড়ুক। সরকারের চেষ্টার অন্ত নেই। স্কুলে বিনামূল্যে বই দেয়া হয়। নোট/গাইড বই প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্কুলশিক্ষক দ্বারা প্রাইভেট পড়ানোও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাতে হয়েছে কি? যতই নিষেধ করা হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা ততই গাইডবইয়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। নিষেধাজ্ঞা প্রাইভেট পড়ানোর বাজারদর আরো বাড়িয়ে দিয়েছে হয়তো। কেন এমন হচ্ছে, রহস্যটা কি?

মূল রহস্যটা হলো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গঠিত যে গাইডবই ও প্রাইভেট পড়া ছাড়া গতি নেই। ঘটনাটা সরকারি কর্মকর্তারা যেমন দেখাতে চান মোটেও তেমন নয়। অর্থাৎ এমন নয় যে, কিছু অসাধু ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির লোক গাইডবই কেনাবেচা ও প্রাইভেট পড়ানোর মতো খারাপ কাজ করে বেড়াচ্ছে। লোকজন সাধু হয়ে যাওয়া মাত্রই সমস্যা দূর হয়ে যাবে। লোকজনকে সাধু হতে বাধ্য করার জন্যই শাস্তির বিধান দিয়ে আইন বানানো হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা যেহেতু লোকজনের সাধু বা অসাধু চরিত্রের সঙ্গে জড়িত নয়, এর গোড়া সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে– সমস্যা কেবল দূর হচ্ছে না তাই নয়, সরকারের প্রাণান্ত চেষ্টার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা বাড়ছে। দেখি, সমস্যার গোড়া কোথায়।

গোড়ায় যাওয়ার আগে একটু আগে থেকে শুরু করি। রহিম-রূপবানের গল্পে দেখা যায়, এক বনের রাজ্যে রহিম যে স্কুলে যেত সেখানকার রাজার মেয়ে তাইজুল তার প্রেমে পড়ে। রাজা এ সম্পর্ক মেনে নেন না। তিনি রহিমকে স্কুল থেকে বের করে দিতে পারতেন। কিন্তু ঘটনাটা আরো জানাজানি হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। রাজা মশাই তাই এ ঝুঁকি নিলেন না। তিনি রহিমের স্কুলে আসার ও শিক্ষার অধিকারে একটু হস্তক্ষেপ না করেই তার ঝরে পড়ার ব্যবস্থা পোক্ত করলেন। তিনি ফরমান জারি করলেন, এখন থেকে প্রত্যেককে জরির পোসাক পরে ও ঘোড়ায় চড়ে স্কুলে আসতে হবে। গরিব রহিম জরির পোসাক ও ঘোড়া জোগাড় করতে না পেরে আপনি স্কুল থেকে ঝরে পড়বে। গল্পে রহিম অবশ্য ঝরে পড়েনি। কেননা স্ত্রী রূপবান তাকে পোসাক ও ঘোড়া দুটোই জোগাড় করে দিয়েছে। আমাদের বাস্তব রহিমদের প্রত্যেকের একজন করে রূপবানও নেই, তাদের জরির পোশাক ও ঘোড়ার গাড়ি কোনোটাই জোগাড় হয় না। ফলে ঝরে পড়তে হয়, না হয় এমন ঘষেমেজে পাস করতে হয়, যা তেমন কাজে লাগে না। আমাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে জরির পোশাক ও ঘোড়ার গাড়ি লাগে না? আসলে তার চেয়েও বেশি লাগে। নোট/গাইড বই লাগে, প্রাইভেট পড়তে হয়। স্কুলে নানারকম ফি আদায়ে বাহানার অন্ত নেই। এ অবস্থাটি টিকিয়ে রাখার পেছনে শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য তাই, যে উদ্দেশ্য তাইজুলের পিতার ছিল।

অবস্থাটাকে কি কৌশলে টিকিয়ে রাখা হয়, দেখা যাক। আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি সবই প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম। মানুষকে শোষণ করা সবচেয়ে সহজ হয় যখন তাকে অভাবের মধ্যে রাখা যায়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ইত্যাদির অভাব। কাগজেকলমে কিন্তু এসবের ১০০% গ্যারান্টি থাকে। কিন্তু বাস্তবে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, চিকিৎসক, পুলিশ, রাস্তাঘাট, যানবাহন ইত্যাদি কখনো থাকে না। অতএব আশ্চর্য নয় যে স্কুল কম, আবার শিক্ষকও কম। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি সমান মনোযোগ দিতে পারেন না। পরীক্ষার আগে সিলেবাস শেষ করতে হবে, এ চাপ থাকে। তিনি 'বাড়ির কাজ' দিয়ে দেন। বাড়িতে শিক্ষার্থীর গাইডবই আর প্রাইভেট শিক্ষকের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি? ছাত্রছাত্রী বাড়িতে পড়ালেখা শিখে ক্লাসে আসে, শিক্ষক তাদের পড়া ধরে আবার 'বাড়ির কাজ' দিয়ে দেন। যে শিক্ষার্থী 'বাড়ির কাজ' করতে পারেনি, সে যেন কোন অপরাধী। শিক্ষক তার জন্য কোনো দায়িত্ব অনুভব করেন না, অথবা তা সম্ভব হয় না। কোন কোন শিক্ষক আবার ইচ্ছে করেও শ্রেণীকক্ষে তার দায়িত্ব পালন না করে প্রাইভেট পড়ানোর সুযোগকে কাজে লাগান। কেনই বা এ সুযোগ কাজে লাগাবেন না? তিনি নিজেও গাইডবই আর প্রাইভেট পড়ে এতদূর এসেছেন আর তার ছেলেমেয়েকেও এ অবস্থার মধ্য দিয়েই যেতে হয়। অসুস্থ হলে তাকেও প্রাইভেট চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে হয়। একেকটা সমস্যা আলাদা আলাদা মনে হলেও মোটেও তা নয়, তারা সব এক অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা হয়ে সমাজের হাতেপায়ে একটি মালারূপী শৃঙ্খল হয়ে আছে।

বর্তমান ব্যবস্থায় গাইডবই বেচাকেনা ও প্রাইভেট পড়া অপরিহার্য। আইন করে এসব বন্ধ করা অসম্ভব, খুব সামান্য কমানো যেতে পারে মাত্র। কেন অপরিহার্য তার আরো কারণ আছে। স্কুল ও শিক্ষক কম তো আছেই, তার ওপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে আছে শিশুর পিঠে বইয়ের বোঝা। শহর ও উপশহরে ভালো স্কুলের শিশুদের তো বই-বওয়া গাধা বানিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রকাশকগণ সাধু ও অসাধু সকল উপায়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে বইয়ের সংখ্যা বাড়াতে থাকেন। অভিভাবকদের বোঝানো হয়, তাদের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হতে না হতেই একেকজন পণ্ডিত হয়ে বেরুবে। নোটবই ও প্রাইভেট পড়ানো ছাড়া এসব বই শিশুকে 'জ্ঞান' গলাধঃকরণ করানো সম্ভব কি? যেসব পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য নেই তাদের শিশুরা না পারে পণ্ডিত হতে, না ন্যূনতম লিখতে-পড়তে-গুনতে শেখে। কদিন আগে ইকোনমিক্সে প্রথম বর্ষে পড়ছে, এমন একজন শিক্ষার্থীকে 'ইকোনোমিক্স' লিখতে